দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 11.1.84 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3 ...

ইন্টারভিউ-সমাচার

চাকরিতন্ত্রের শেষকথা 'ইন্টারভিউ'র স্বাদ গ্রহণ; যাঁরা চাকরি পেয়েছেন তাঁদের সবাইকেই 'ইন্টারভিউ' শব্দটার স্বাদ নিতে হয়েছে। আর যারা চাকরির প্রত্যাশায় তাঁদের অবশ্যই ইন্টারভিউ বোর্ড নামে বোটে উঠে প্রমাণ করতে হবে কর্মজীবনে তিনি একজন দক্ষ কর্মী হবেন তবেই বেকারত্বের মহাসমুদ্র যাত্রা শেষ হবে নচেৎ নয়।

ইন্টারভিউ দুই প্রকার—একটা লিখিত অপরটা মৌখিক। লিখিত ইন্টারভিউর প্রশ্নমালা সবার জন্য একই রকম হয় তবে নকলবাজির ব্যবস্থা করতে পারলে নম্বরটা উপরের দিকে থাকে। কিন্তু মৌখিক সেটার কি ব্যবস্থা? সেটারও ব্যবস্থা আছে—তদবীর। মোটা মোটা মামা চাচার কেন বা হাত চিঠি ব্যাস। আলকালি মিকচারের মত কাজ করে। ওটা এমনই ওষুধ যাকে নিতে হবে তার প্রশ্ন হবে—আপনার নাম? বাড়ি ইত্যাদি আর যাকে বাদ দিতে হবে তার প্রশ্ন হবে সিরাজউদ্দৌলার বাপের নাম? মহাকাব্যের রচয়িতা? আমাদের দেশে কে প্রথম নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রশ্ন হচ্ছে এই যে ইন্টারভিউ এতে কি সত্যই দক্ষকর্মী বাছাই হয়। যাঁরা উত্তর দিতে ব্যর্থ হয় তাঁরা কি সত্যই অদক্ষ? এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া মুশকিল কারণ একস্থানে যিনি অদক্ষ বলে প্রমাণিত হয়েছেন অন্যস্থানে তিনিই আবার নিজেকে দক্ষ বলে প্রমাণ করেছেন এবং চাকরিও পেয়েছেন এর সত্যতা যাচাই অপ্রয়োজন। অতএব স্বীকার করুন আর না করুন দক্ষ আর অদক্ষ বাছাইয়ের মধ্যে আছে নানান ঘাপলা। এই বাছাইয়ের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমি আমার একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলছি।

আপনারা আজকাল শুনছেন এবং অনেকে হয়ত দেখেছেনও যে বিয়ের ব্যাপারেও মেয়েদের ছেলেদের কাছে ইন্টারভিউ দিতে হচ্ছে। এই রকম ইন্টারভিউ নিতে আমি একদিন এক ছেলের পীড়াপীড়িতে এক মেয়ের বাড়িতে হাজির হয়েছিলাম। মেয়েপক্ষ বেশ বড়লোক। আমাদের জন্য ভূরি ভোজের আয়োজন হয়েছিল বিরাট। খাওয়া দাওয়া পর্ব শেষ হলে মেয়ে এসে বসেছিল সোফায়। মেয়ের আপাদমস্তক নিরীক্ষণের পর ছেলে প্রশ্ন করেছিল—উঠে দাঁড়ান, ঘোমটা খুলুন, একটু হাঁটুন, একটু হাসুন। আপনি গান জানেন? নজরুল গীতি? রবীন্দ্র সঙ্গীত? আধুনিক? এম এ পড়ে বসে না থেকে চাকরি করেন না কেন? নাচতে জানেন? রাঁধতে জানেন? হাতের কাজ কেমন? মেয়েটি অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল। রান্না ও হাতের কাজের কথা উঠতে মেয়ের বাপ বলেছিলেন চাইনীজ যে সব রান্না খেলেন সবই মেয়ের তৈরী আর যেসব পোশাক পরিচ্ছদ দেখছেন সবই ওর সেলাই। কিন্তু বিয়ের পর বছর না ঘুরতেই ইন্টারভিউর ফাঁকি ধরা পড়ে গিয়েছিল। মেয়েটি রান্না ও হাতের কাজ—ও দুটোর কোনটাই জানত না। মেয়েটি ইন্টারভিউতে টিকে গিয়েছিল বাবার পয়সা—চাইনিজ রেস্টুরেন্ট আর গারমেন্টস দোকানের বদৌলতে। সবই দোকান থেকে কিনে এনে চালিয়ে দেওয়া হয়েছিল মেয়েটির নামে; তার চেয়েও মজার ব্যাপার হলে, মেয়েটি ছিল ঐ অঞ্চলের সেরা এ্যাথলেট সেটা কিন্তু ইন্টারভিউতে প্রকাশ পায়নি। অতএব আসল-নকল বাছবেন কি করে? ইন্টারভিউই কি একমাত্র উপায়, এ প্রশ্নের জবাব কি?

ইন্টারভিউতন্ত্রের আগে একটু পাঠ্যতন্ত্রের ও পরীক্ষাতন্ত্রের কেরামতিটা অনুধাবন করা দরকার। আজ থেকে ৪০ বছর আগে যখন হাতে খড়ি দিয়েছিলাম ওস্তাদজী বাড়িতে এসে ঈশ্বরচন্দ্রের বর্ণ পরিচয় খুলে বলেছিলেনঃ বাবু পড় অ'তে অজগর। কয়দিন পর শ্লেটে লম্বা এক পূর্ণচ্ছেদ দিয়ে বলেছিলেন পড় 'আকার' তার কিছুদিন পর আবার স্টেন্ডার্ড ইংরেজির মত আঁক কেটে পেটে ছোরা বসানোর মত এক দাগ দিয়ে বলেছিলেন পড় 'এ' এই যে পড়া শুরু তখন বুঝিনি ঈশ্বরচন্দ্র কেন অ'তে অজগর ছবি বেছে নিয়েছিলেন। এখন বুঝি। সারাটা জীবন সমস্যা অজগরের মত হা করে থাকবে তার মধ্যেই পথ চলতে হবে। বড় হওয়ার সাথে সাথে বইয়ের পাহাড় জমতে লাগল তার সাথে হাত না থাকলেও ড্রয়িং আর পা না থাকলেও ড্রিলের সিলেবাস। ইতিমধ্যে পরীক্ষাতন্ত্রের সাথে পরিচয় ঘটে গেছে। গাদা গাদা বই পড়ে প্রশ্ন ১০টা কি ১২টা। পরীক্ষাতন্ত্রের সঙ্গে পরিচয়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল আরও কয়টা শব্দের সঙ্গে ইম্পর্টেন্ট, সাজেশনস, সিওর সাকসেস, গৃহশিক্ষক আর নকল। পরীক্ষা বৈতরণী পার হতে একটা না একটা পথ বেছে নিতেই হয়েছিল। তখন মনে হয়েছিল, আমরা সবাই জ্যাক অব অল ট্রেড মাস্টার ইন নান—করখানার ছাত্র। কথাটি মিথ্যা হলে বিজ্ঞানের ছাত্রকে নিশ্চয় দেখতেন না পুলিশের পোশাকে, সাহিত্যের ছাত্রকে আবহাওয়া অফিসে, ওকালতী পড়া ছাত্রকে ব্যাংকের চত্বরে। সর্বত্রই ভেজাল। কোথায় আসল খুঁজবেন? গোটা ব্যবস্থাটাই যে ভেজাল। বিজ্ঞানের যুগে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন, মানুষ আজকাল যন্ত্র দিয়ে কাজ সারছে। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ এমনকি গতি, শক্তি প্রভৃতি সবই কম্পিউটার কন্ট্রোল করছে। অতএব পড়ে আর কি হবে? মার্কশীট ও সার্টিফিকেট ছাপিয়ে বিক্রি হচ্ছে আর তা খরিদ করে ছেলেরা আসল বলে চালিয়ে দিচ্ছে। কিছুদিন আগে জাল মার্কশীট দেখিয়ে মেডিক্যালে ভর্তি হওয়া কয়েকজন ছাত্রকে বহিষ্কার করার খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ইন্টারভিউ বৈতরণী পার হওয়ার ব্যাপারটা তারাও ম্যানেজ করেছিল। ধরা না পড়লে তাদের মধ্যে অনেকেই যে মানুষ মেরামতের সার্টিফিকেটও হাতিয়ে ফেলতো না এটা কে বলতে পারে? আসলে নকল-আসল, বোঝার উপায় নেই। সবই যখন হ-য-ব-র-ল তখন ইন্টারভিউ কেমন করে নির্ভেজাল হবে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে আসলটা বাছাইয়ের ব্যবস্থা কি?

বাছাই দুই কারণে হয়। চাকরি দেওয়ার জন্য বাছাই আর পদোন্নতি দেওয়ার জন্য বাছাই। ডাক্তার যেমন ইঞ্জিনীয়ার নন ইঞ্জিনীয়ারও তেমনি ডাক্তার নন। যার যে পেশা তিনি সেই কাজ করেন। নিজ নিজ পেশাকে ভিত্তি করে সামাজিকভাবে আমরা বলি, জেলে, কামার, কুমার, তাঁতী ইত্যাদি। কিন্তু শিক্ষা সমাপনীতে আমাদের দেশে পড়ার সঙ্গে কর্মের মিল নগণ্যই। চাকরি দেওয়ার আগে যে বাছাই সেখানে পড়ার সঙ্গে কর্মের যোগসূত্র একান্ত প্রয়োজন কিন্তু পদোন্নতির জন্য যে বাছাই সেটা হওয়া উচিত কর্মজীবনে ব্যক্তিটির অবদানের উপর ভিত্তি করে। শুধু ইন্টারভিউর উপর ভিত্তি করে নয়। একটি কাহিনী শুনলে এ ধরনের ইন্টারভিউর অসারতা বোঝা যাবে। কোন একটি সংস্থা কর্মচারীবৃন্দের চাকরির বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বিভিন্ন ... তার কর্ম পর্যালোচনা করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া সিআরএ রেখেছিলেন মোট ৭৬ নম্বর। আর ইন্টারভিউ বোর্ড তাদের হাতে রেখেছিল ২৪ নম্বর। একজন ৭৬ নম্বরের মধ্যে ৬৪ নম্বর পেয়ে এককভাবে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল। দেখা গেল বোর্ডে যেয়ে ফেল। বোর্ডের পছন্দ নয়—অতএব হাতের নম্বর হাতেই রয়ে গিয়েছে। এ ব্যাপারে একটা গল্প বলা যাক। কোন এক গ্রামে বদরুদ্দী নামে একটি লোকের এক মুদিখানার দোকান ছিল। তার দোকানে যে সওদা করতে আসত, সওদা শেষে বদরুদ্দী একটা শ্লেটে যোগ করে মোট কত টাকার সওদা হয়েছে সেটা বলে দিত। একদিন ঐ গ্রামের এক সরল মানুষ আমীর শেখ সওদা করেছিল বদরুদ্দীর দোকানে। বদরুদ্দী যথা নিয়মে শ্লেটে যোগ শুরু করেছিল—চাল ১০ টাকা, আদা ২ টাকা, পেঁয়াজ ৩ টাকা, তেল ৭ টাকা। ১০ যোগ দুই বারো যোগ তিন পনেরো যোগ সাত বাইশ। বাইশের দুই নামে হাতে থাকে দুই। আমীর শেখ বদরুদ্দীর হাত চেপে ধরে বলেছিল নগদ পয়সা দিয়ে সওদা করছি তুমি হাতে রাখার কে? এ প্রশ্নের উত্তর যেমন সেদিন বদরুদ্দী দিতে পারেনি তেমনি ৭৬ নম্বরের মধ্যে ৬৪ নম্বর পেয়ে এককভাবে যে দ্বিতীয় হলো বোর্ডে যেয়ে সে পাস হল না এর জবাবও অনেকের জানা নেই। বোর্ডের ইচ্ছা ও অনিচ্ছা একটি নিবেদিত প্রাণ একনিষ্ঠ কর্মীর কর্মপ্রেরণার অনেক সময় সলিল সমাধি ঘটায় এমন দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি আছে। অতএব হাতের নম্বর পাতে পড়বে এটার যেহেতু কোন নিশ্চয়তা নেই সেইহেতু নম্বর হাতে রেখে অনেক কর্মোদ্যোগী কর্মচারীর কর্মপ্রেরণার উৎস বন্ধ করে দেওয়ারও কোন যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না।

সুতরাং শুধু ইন্টারভিউর নয় বাস্তবে কাজের ফলাফলও দেখা দরকার।

—মোঃ আনসার হোসেন